Bodhsandhya
Eleven Edition
May, 2008

দ্বাদশ বর্ষ,
একাদশ সংখ্যা
মে, ২০০৮

প্রকাশক ঃ
বোধসন্ধ্যা
এস - ৪৩৯, গ্রেটার কৈলাশ
পার্ট - টু
নিউ দিল্লী - ১১০০৪৮

প্রচ্ছদ
শম্পা সরকার (দাস)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস, মুদ্রণ ও অলংকরণ
রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লী - ১১০০১৯
ফোন ঃ ৪১৬০৩৯৯৬ / ৯২১৩১৩৪৪৮৭

ছোটবেলার নকশী-কাঁথা

তনুকা ভৌমিক এন্দ

ছোটবেলার কথা বললে সবচেয়ে আগে মনে আসে আমাদের পাড়ার কথা — বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড গভর্মেন্ট হাউসিং এস্টেট। বি.সি. রোডের কোয়ার্টার বলতে আমার কাছে বোঝায় অনেক বন্ধুবান্ধবের, পরিচিতদের সাথে কাটানো দশ-বারো বছরের উষ্ণ স্মৃতি।

মোট আটচল্লিশটা সরকারী ফ্ল্যাটওয়ালা পাঁচিল-ঘেরা এই হাউসিং এস্টেটে আমরা থাকতে আসি, যখন আমার বছর নয়েক বয়স। আমাদের পাড়ায় তিনটে খেলার মাঠ ছাড়াও ছিল একটা বড় পার্ক। সেই পার্কের দিকে মুখ-করা 'ই' ব্লকে তিনতলার ফ্ল্যাটে এসে উঠলাম আমরা। আমরা অর্থাৎ বাবা-মা, দুই দাদা, দিদি, দুই কাকা, কাজের লোক আর আমি। বাড়িতে বাবা-মা আর বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজন মিলে সব সময় হৈ-হট্টগোল আর তারই সঙ্গে একটা নিরাপত্তা। এরা সবাই আছে। সামনে তাকিয়ে আরও যতদিন দেখা যায়, থাকবে। কেমন যেন একটা ওমের মধ্যে বড় হয়ে উঠছিলাম। নতুন পাড়ার সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে উঠতে মনে হল যে গোটা পাড়াতেও যেন এই উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই আমার খুব চেনা, আমার কাছের লোক।

বি.সি. রোডের বাড়িগুলো ছিল চারতলা, হালকা হলুদ রঙের। প্রতি ফ্ল্যাটে দুটো বারান্দা। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই আশে-পাশের বারান্দাতে, জানলায় চেনা মুখ দেখা যেত। শুরু হয়ে যেত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আড্ডা। এক দঙ্গল মেয়ে মিলে আমরা রোজ বিকেলে খেলতাম। লুকোচুরি, আই স্পাই, কাপাডি ছাড়াও আমাদের একটা প্রিয় খেলা ছিল 'পিট্টু'। সাতটা চ্যাপটা পাথর একটার উপর একটা সাজিয়ে রেখে তার চারপাশে গণ্ডী কেটে দিতে হয়। দু' দলের লড়াই হয় কারা বল দিয়ে সেটাকে ভেঙে আবার সাজাতে পারবে। খেলার নেশা এত বেশী ছিল যে মনে পড়ে, স্কুল থেকে ইউনিফর্ম বদলে কোন মতে তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়েই দৌড়তাম নীচে। খেলা শেষ হলে ঘেমে-নেয়ে পার্কে বসে আড্ডা। কেমন ছিল সে সব বিকেল? পার্কের ঘাসের উপর উসকো-খুসকো চুল নিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত বসে আছি আমরা কয় বন্ধু। ঘাসের তলার নরম মাটির সোঁদা ভাব টের পাচ্ছি। হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে শরীরের ঘাম শুকিয়ে দিল। 'চানা গরম' বলতে বলতে সাদা টুপি, সাদা ধুতি-ফতুয়া পরা ফেরীওয়ালা চলে গেল পার্কের পাশ দিয়ে। ঝুপ করে কখন যেন অন্ধকার নেমে এসেছে, চারদিকের বাড়িতে এক এক করে জ্বলে উঠছে হলুদ আলো। পার্কের রেলিংগুলো আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে সেই ভিজে-ভিজে ঘাসের উপর গোল হয়ে বসে আমরা গল্প করে যাচ্ছি যতক্ষণ না — 'মানু! শীগ্‌গির বাড়ী এস! পড়তে বসতে হবে না?' — দিদির গলা পাই। অন্য সকলের জন্যও ডাক আসতে শুরু করেছে, অগত্যা গুটি গুটি পায়ে বাড়ির দিকে রওনা।

শীতকালে অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হলে আরও মজা। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা, আটটা অবধি ব্যাডমিন্টন খেলা, তারপর বাড়িতে অপেক্ষা করছে গল্পের বই। মনে আছে দিদি একবার বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী থেকে একটা রঙীন রূপকথার বই এনে দিয়েছিল — সে বই কি যত্ন করে পড়তাম, তারিয়ে তারিয়ে ধীরে ধীরে তার স্বাদ নিতাম! তারপর রাত হলে যখন চোখ ঢুলুঢুলু — মাকে বলে দিচ্ছি আজ রাতে আর খাব না — তখন মা কত ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে আসত, গল্প বলে নিজে হাতে খাইয়ে দিত। তারপর কোন মতে বিছানায় পৌঁছেই ঘুম! সেসব দিনের স্বাদই আলাদা। দিনগুলো যেন নদীর স্রোতের মত, একটা গড়িয়ে আর একটায় মিশে যেত। কখন যে দিন গেল টের পেতাম না।

সেই রোদে ঝিকমিক রূপোলী দিনের স্রোতে গরমের ছুটি আসত একটু বিশেষ স্বাদ নিয়ে। সক্কালবেলা বন্ধুরা মিলে বেরোতাম মর্ণিং-ওয়াকে। ফিরতাম যখন, তখন হাতে একগোছা জংলী ফুল, কি কয়েকটা পেয়ারা বা রঙীন কাঁচের টুকরো। রঙীন কাঁচ কুড়িয়ে জমানো ছিল আমাদের নেশা — ছাইগাদা ঘেঁটে অবধি বার করতাম বাহারী ডিজাইনের ভাঙা কাপ-প্লেটের টুকরো। পাড়ায় আমাদের কিছু পুষ্যিও জুটেছিল; একটা মা-কুকুর আর তার ক'টা ছানা। বাড়ি থেকে হাতে গড়া রুটি এনে তাদের খাওয়াতাম। কাজেই আমাদের পিছন পিছন অনুগত কুকুরবাহিনীকে চলতে দেখলে কেউই আশ্চর্য হত না। গরমের ছুটির দিনগুলোর প্রায় অনেকটাই কেটে যেত বন্ধুদের বাড়িতে পুতুল-খেলা বা অন্য কোন খেলা খেলে। বিকেলে পার্কে দোলনা চড়ার আকর্ষণ ছিল। কিন্তু একা একা নয়, সব সময় চেষ্টা করতাম কি করে নতুন ভাবে

দোলনা চড়া যায়। কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও উল্টো হয়ে বসে, কখনও চার-পাঁচজন একসাথে চড়তাম দোলনায়। আবার কখনও দোলনার গতি কমে এলে উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়তাম ঘাসের উপর। আর একটা আকর্ষণ ছিল পাড়ার বাইরে দেওদার স্ট্রীটে গিয়ে হজমী খাওয়া। কি কখনও ফুচকা, চুরমুর।

শৈশবের থেকে কৈশোরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এল নানা নতুন অনুভূতি। নতুন করে আবিষ্কার করলাম সমবয়সী ছেলেদের। বন্ধুদের ভাই বলে যাদের এতদিন পরিচয় ছিল, সময় বিশেষে যারা বান্ধবীদের মতই নিজেদের খেলার সঙ্গী ছিল, তারা যেন ধীরে ধীরে অচেনা হয়ে উঠল। বই পড়ার অভ্যেস আমার সব বন্ধুরই ছিল। এতদিন পড়তাম 'এনিড ব্লাইটন'-এর লেখা মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলের গল্প, বাচ্চাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, রহস্য-উপন্যাস। এখন খুঁজে খুঁজে প্রেমের গল্প পড়ার দিকে ঝোঁক বেড়ে উঠল। অবশ্য এর সঙ্গে আরও নানা বিষয়ে কৌতূহল বেড়েছিল — ভাল সাহিত্য, আঁকা, লেখা, সব বিষয়েই। যার দরুণ বাড়িতে কয়েক বছরের মধ্যে বৃটিশ ও আমেরিকান নাট্যকার ও লেখকদের অনেক বই এই সময়ে পড়েছি। মনে আছে, 'ইউজিন ওনীল' আর 'আর্থার মিলার'-এর নাটক মনে খুব দাগ কেটেছিল। রবীন্দ্রনাথের গল্প-নাটক-গান তো সব সময়ের সঙ্গী। গান শোনার এক নতুন আনন্দ, প্রকৃতিকে দেখার এক নতুন আনন্দ আবিষ্কার করলাম। কত দুপুরবেলা আমাদের তিনতলার বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কেটেছে। বাইরে পার্কে নানান্ গাছের অবস্থা থেকে ঋতু আন্দাজ করা যেত। গরম পড়লে পার্কের গেটের সামনে বড় আমগাছটায় মুকুল দেখা দিত — সাদাটে সবুজ রঙের মঞ্জরী যেন কেউ থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে। গরম বাড়লে তাতে কচি আমের থোকা ঝুলত। এই সময়ে পার্কের ডানপাশে দেখা যেত আগুন-রঙের কৃষ্ণচূড়া ফুল। আবার মেঘলা আকাশে ছাইরঙা মেঘের বুকে কমলা কৃষ্ণচূড়া দেখা দিত নতুন রূপে। শীতকালে দেখতাম দূরে পার্কের পিছন দিকে শিমুল গাছ থেকে ফল ফেটে সাদা তুলো উড়ে যাচ্ছে। এইসব দুপুর কেমন যেন উদাস করা ছিল, যখন শূন্যদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নেশা ধরে যেত, অথচ মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা কষ্ট টের পেতাম।

বড় হয়ে ওঠার সবচেয়ে বড় লক্ষণ ছিল নিজেদের চেহারা, পোশাক-আশাক সম্বন্ধে সচেতনতা। সব সময়ে মনে হত নিজের মুখ-চোখ-নাক-রঙ সব খারাপ আর অন্যদের সব ভাল। কতবার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি — আমার রঙ ফর্সা করে দাও, আমাকে সুন্দর করে দাও। পাড়ায় ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার সুযোগ আসত উৎসবের সময়। বছরের শুরুতেই সরস্বতী পুজো। পুজোর জন্য পাড়ায় চাঁদা তোলা, মণ্ডপ তৈরি, আগের দিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুর আনা, সবেতেই আমাদের যত না কাজ তার থেকে বেশি ব্যস্ততা। পুজোর দিন আর তার আগে-পরে দু-এক দিন আলো ঝলমল মণ্ডপে চেয়ার পেতে বসে আড্ডা আর মাইকে বাজানো গান শুনতে খুব ভাল লাগত। সরস্বতী পুজোর পরেই আমাদের পাড়ায় হত বড় করে 'ফাংশন'। সেই নিয়ে একমাস আগে থেকে উত্তেজনা। এখন মনে হয়, আসল দিনের ফাংশনের তুলনায় রিহার্সালগুলোতে অনেক বেশী মজা হত। এইসব ফাংশনের ভাল দিক হল যে এই সুযোগে যার যে বিষয়ে প্রতিভা আছে, সে তা' দেখানোর ও চর্চার সুযোগ পেত। দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের সৃষ্টিধর্মী কাজে জড়িয়ে থাকার দরুণ কৈশোর থেকে যৌবনের পথে ছেলেমেয়েদের যে বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা আমরা কিছুটা এড়াতে পেরেছিলাম। তৃতীয়তঃ, রিহার্সালে ছেলেমেয়েরা সহজভাবে, কাজের সূত্রে মেলামেশার সুযোগ পেত বলে তাদের পরিচয়েও একটা সহজ বন্ধুত্বের সুর বেজে উঠত। সবথেকে বড় কথা, সকলে মিলে কোন কাজ করার মধ্যে যে আলাদা আনন্দ আছে, যা নিজের সুখের ছোট্ট গণ্ডীর সীমাবদ্ধতার বাইরে, তা আমরা গভীরভাবে অনুভব করতাম।

ঘুরে-ফিরে ছোটবেলার কথায় কেন ফিরে আসি? বোধহয় এই জন্য যে, একমাত্র ঐ সময়েই আমাদের আত্মসচেতনতা খুব কম থাকে, কৌতূহল বেশী। চারদিকের রঙে-গন্ধে ভরা জীবনে ডুবে থাকি আমরা, কিন্তু সেই জীবন আমাদের ভাবায় না। তাই তখনকার হাসি, কান্না, অনুভূতি, বড়বেলার তুলনায় অনেক খাঁটি, তাতে সচেতন মনের ভাবনা-চিন্তার ভেজাল অনেক কম। দেখতে দেখতে ছোটবেলার এই দিনগুলো পেরিয়ে কবে বড় হয়ে উঠলাম জানি না। তবে, এখনও স্মৃতির পাখায় ভর করে উড়ে যেতে ভাল লাগে সেই দিনগুলোর কাছে। ভাল লাগে নানান্ রঙে রাঙানো এই নক্শীকাঁথা বুনতে।